بسم الله الرحمن الرحيم

# যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ১৬ জানুয়ারি, ২০২৬ মোতাবেক ১৬ সুলাহ, ১৪০৫ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

গত একটি খুতবায় আমি মহানবী (সা.)-এর সীরাত তথা জীবনচরিতের আলোকে তাঁর ঐশীপ্রেমের দিকটি উল্লেখ করেছিলাম। এ সম্পর্কেই আজ আরো কিছু বর্ণনা করব। যৌবনকালে এবং নবুয়ওতের দাবির পূর্বেও মহানবী (সা.)-এর মাঝে খোদাপ্রেমের এমন এক প্রবল উচ্ছাস ও উদ্দীপনা ছিল যে, এ কারণে তিনি (সা.) ব্যাকুল হয়ে গুহায় চলে যেতেন এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে একান্ত আলাপে নিমগ্ন হতেন। এই ভালোবাসার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেন:

"আমি লক্ষ করছি, গ্রীষ্মকালের সাথেও আধ্যাত্মিক উন্নতির এক বিশেষ যোগসূত্র রয়েছে। মহানবী (সা.)-কে দেখো, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে মক্কার মতো শহরে সৃষ্টি করেছেন এবং এরপর তিনি এই তীব্র গরমের মধ্যে নির্জনে হেরা গুহায় গিয়ে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করতেন; তা কত–না বিস্ময়কর যুগ ছিল। তিনি (সা.) নিজেই হয়ত পানির একটি মশক তুলে নিয়ে যেতেন। আসল বিষয় হলো, যখন আল্লাহ্ তা'লার সাথে গভীর অন্তরঙ্গতা ও আধ্যাত্মিক স্বাদ সৃষ্টি হয়ে যায়, তখন জগৎ ও জগদ্বাসীর প্রতি এক প্রকার ঘৃণা ও অনীহা জন্মে। প্রকৃতিগতভাবেই তখন নির্জনতা ও একাকীত্ব ভালো লাগে। মহানবী (সা.)-এরও এই অবস্থাই ছিল। আল্লাহ্ তা'লার প্রেমে তিনি এমনভাবে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন যে, তিনি সেই নির্জনতাতেই পূর্ণ স্বাদ ও তৃপ্তি পেতেন। এমন একটি স্থান– যেখানে কোনো আরাম বা স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ ছিল না, যেখানে যেতেও ভয় লাগত– সেখানে তিনি একাই রাতের পর রাত কাটাতেন। এথেকে এটিও জানা যায়, তিনি কত সাহসী ও বীরপুরুষ ছিলেন। যখন আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় হয় তখন বীরত্বও সৃষ্টি হয়, তাই মু'মিন কখনো ভীরু হয় না। জগৎপূজারীরা ভীরু হয়; তাদের মধ্যে সত্যিকার বীরত্ব থাকে না।"

আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক যত সুদৃঢ় হয় এমন মানুষ ততই নির্জনতা ও একাকীত্ব পছন্দ করে– এ কথাটি শুনে কিছু লোক আপত্তি তোলে যে, তাহলে নবী ও রসূলদের স্ত্রী-সন্তান কেন থাকে? [তারা যদি নির্জনতাই এত পছন্দ করেন তবে কেন স্ত্রী-সন্তান রাখেন, কেন বিয়েশাদি করেন?] তারা তো বাজারে-বন্দরে চলাফেরা করেন এবং পানাহার করেন। পবিত্র কুরআনেও এর উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু পরিতাপ! এমন আপত্তি উত্থাপনকারীরা চিন্তা করে না যে, এদের দৃষ্টান্ত তো এমন যেমন কোনো ব্যক্তি কারো দরজায় ভিক্ষা চাইতে যায় এবং অন্য আরেকজন তার বন্ধু, যে কেবল তার সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছে। এখন সেই বন্ধু যদি তার বন্ধুর সামনে পোলাও ইত্যাদি পেশ করে তাহলে এতে তার (বন্ধুর) কী দোষ? [দুইজন যাচ্ছে, একজন যায় ভিক্ষা চাইতে আর আরেকজন যাচ্ছে বন্ধু হিসেবে। এখন গৃহকর্তা যদি বন্ধুকে যত্নআত্তি করে তাহলে এতে তার (বন্ধুর) অপরাধ কোথায়? অর্থাৎ সেই বন্ধু, যে তার বন্ধুর সাথে দেখা করতে গিয়েছে– তার তো কোনো অপরাধ নেই!] সেই বন্ধু তো তার (বন্ধুর) আহারে তৃপ্তি পায়, কিন্তু সেই ফকির বা

ভিখারীকে তো শুকনো রুটির টুকরো দেওয়া হয়। যদি সে বেশিক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করে তাহলে (তাকে) ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হয়। দুধরনের ব্যবহার রয়েছে; ভিখারীর সাথে এক ধরনের আচরণ আর বন্ধুর সাথে ভিন্ন ব্যবহার। [অথচ বন্ধুর ক্ষেত্রে এমনটা হয় না যে, তাকে ধাক্কা দেওয়া হবে। বরং তার দীর্ঘ অবস্থান এবং তার পানাহারে গৃহকর্তা স্বয়ং এক প্রকার আনন্দ লাভ করেন। ফকির বা ভিখারীর সাথে এক ধরনের আচরণ হয় আর বন্ধুর সাথে ভিন্ন ব্যবহার করা হয়।] বন্ধুর সমাদর করা হয়, যত্নআত্তি করা হয়, আর ফকিরকে কিছু দিয়ে বিদায় করা হয়।

তিনি (আ.) বলেন, "নবী ও মা'মুরদের (তথা আল্লাহ্ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষদের) অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। তাদের সামনে যা কিছু আসে তা তাদের প্রবৃত্তির আকাঙ্ক্ষার ফলে নয়। তারা তো সকল প্রকার স্বাদ ও প্রশান্তি আল্লাহ্ তা'লার যিকর এবং তাঁর মাঝে নিমগ্ন হওয়াতেই খুঁজে পান আর প্রকৃতপক্ষে তারা নির্জনতাকেই পছন্দ করেন, যেখানে তারা তাদের প্রিয়তমের কাছে নিজেদের মনের আকুতি ও আকাঙ্ক্ষা উপস্থাপন করেন এবং তারা চান– এই অবস্থায় যেন কেউ তাদের দেখতে না পায়। এছাড়া এই সম্পর্কবন্ধন তাদের পূর্ণতার জন্য হয়ে থাকে। [অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার সাথে তাদের ভালোবাসার যে বন্ধন রয়েছে, সেটির একটি সর্বোচ্চ মান অর্জনের জন্য এগুলো হয়ে থাকে।]

হেরা গুহায় আল্লাহ্‌র ইবাদতের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত আয়েশা (রা.) একটি হাদীসে অত্যন্ত বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন, যা তিনি (সা.) তাকে বলেছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন,

মহানবী (সা.)-এর প্রতি সর্বপ্রথম যে ওহী শুরু হয়েছিল, তা ছিল ঘুমের মধ্যে সত্যস্বপ্ন দেখা। তিনি (সা.) যে স্বপ্নই দেখতেন, তা একেবারে দিবালোকের ন্যায় প্রকাশ পেত। [সত্য স্বপ্ন দেখতেন এবং দ্রুত তার ফলে যেত।] এরপর তাঁর অন্তরে নির্জনবাসের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি হয় এবং তিনি হেরা গুহায় একাকী থাকতে এবং সেখানে ইবাদত করতে আরম্ভ করেন। এই ইবাদত কয়েক রাত ব্যাপী হতো, যা তিনি নিজের পরিবারের কাছে ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা জাগার পূর্বেই সম্পন্ন করতেন। আর এজন্য তিনি পাথেয় সাথে নিয়ে যেতেন। [অর্থাৎ কিছু খাবার ও পানীয় সাথে নিয়ে যেতেন।] এরপর কিছু দিন অতিবাহিত হলে তিনি (সা.) হযরত খাদিজা (রা.)-র নিকটে ফিরে আসতেন এবং সমপরিমাণ রাতের জন্য পুনরায় আরো কিছু পাথেয় সাথে নিয়ে যেতেন। অবশেষে তাঁর কাছে সত্য (ওহী) আসে এবং সেই সময় তিনি হেরা গুহায় ছিলেন। তাঁর সমীপে ফেরেশতা আসেন এবং বলেন, "পড়ো"। তিনি বলেন, "আমি তো কখনোই পড়ব না" (অর্থাৎ পড়তে জানি না)। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলতেন, সেই ফেরেশতা আমাকে (জাপটে) ধরেন এবং আমাকে এত জোরে আলিঙ্গন করেন যে, আমার শক্তি নিঃশেষ হবার উপক্রম হয়। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দেন এবং বলেন, "পড়ো"। আমি বলি, "আমি পড়ব না, আমি তো পড়তেই জানি না।" পুনরায় তিনি আমাকে ধরেন এবং দ্বিতীয়বার সজোরে এমন চাপ দেন যে, আমি অচেতন হয়ে পড়ি। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলেন, "পড়ো"। আমি বললাম, "আমি পড়ব না।" তারপর তিনি আমাকে জাপটে ধরেন এবং তৃতীয়বার সজোরে চাপ দিয়ে ছেড়ে দেন ও বলেন,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (সূরা আল-আলাক্ব: ২-৪)

অর্থাৎ **"পাঠ করো তোমার সেই প্রভু-প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন; মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এক জমাট রক্তপিণ্ড থেকে। তুমি পাঠ করো! আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক পরম দয়ালু ও সবচেয়ে সম্মানিত।"**

এই আয়াতগুলো নিয়ে মহানবী (সা.) গুহা থেকে (বাড়িতে) ফিরে আসেন। যখন তিনি হযরত খাদিজা (রা.)-র নিকট বাড়িতে আসেন, তখন তাঁর হৃদয় কাঁপছিল। তিনি (সা.) হযরত খাদিজা (রা.)-কে বলেন, "আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।" অতঃপর তিনি তাঁকে (সা.) চাদর দিয়ে ঢেকে দেন, এরপর তাঁর অস্থিরতা দূর হতে থাকে। তখন তিনি হযরত খাদিজা (রা.)-র কাছে পুরো ঘটনা বর্ণনা করেন এবং বলেন, **"আমি নিজের জীবনের ব্যাপারে আশঙ্কাবোধ করছি।"** তখন হযরত খাদিজা (রা.) বলেন, "কখনোই নয়। আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ আপনাকে কখনোই লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেন, অসহায়দের বোঝা বহন করেন, সেসব পুণ্যকাজ করেন যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, অতিথিসেবা করেন এবং সত্যের পথে বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করেন। [প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আপনি সর্বদা সত্যের পক্ষ অবলম্বন করেছেন।]"

এরপর হযরত খাদিজা (রা.) তাঁকে নিজের চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন নওফলের কাছে নিয়ে যান, যিনি আসাদ বিন আব্দুল উযযার পুত্র ছিলেন। ওয়ারাকা সেই ব্যক্তি, যিনি অজ্ঞতার যুগে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং হিব্রু ভাষা লিখতে ও পড়তে পারতেন। ইঞ্জিল থেকে আল্লাহ্ তা'লা যা চাইতেন তা তিনি হিব্রু ভাষায় লিখতেন। তিনি অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ ও দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েছিলেন। হযরত খাদিজা (রা.) তাকে বলেন, "হে আমার চাচার পুত্র! আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা শুনুন।" ওয়ারাকা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, "হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি কী দেখছো?" তখন মহানবী (সা.) যা কিছু দেখেছিলেন তা তাকে অবহিত করেন। ওয়ারাকা তাঁকে বলেন, "ইনি সেই শরীয়তবাহী ফেরেশতা, যাঁকে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মুসা (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন। হায়! আমি যদি সেই সময় যুবক হতাম! হায়! আমি যদি সেই সময় জীবিত থাকতাম যখন তোমার জাতি তোমাকে বহিষ্কার করবে!" তখন মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, "তারা কি আমাকে বের করে দেবে?" তিনি বলেন, "হ্যাঁ। তুমি যে বাণী নিয়ে এসেছ, যখনই কোনো ব্যক্তি এমন বাণী নিয়ে এসেছে তখন অবশ্যই তার সাথে শত্রুতা করা হয়েছে। আর যদি আমি তোমার সেই যুগটি পাই, তবে আমি কোমর বেঁধে তোমাকে সাহায্য করব।" এর কিছুদিন পরই ওয়ারাকা মৃত্যুবরণ করেন এবং ওহীর ধারাও কিছুকালের জন্য স্থগিত হয়ে যায়।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আসল কথা হলো, কুরআনের শিক্ষার আলোকে আমরা বিষয়টি এভাবে জানতে পারি যে, একদিকে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে নিজের করুণা, আশিস, দয়া এবং কৃপারাজির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন এবং নিজের 'রহমান' বা অযাচিত দানকারী হবার (বিষয়টি) প্রকাশ করেন, আবার অন্যদিকে বলেন,

أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (সূরা আন-নাজম: ৪০)

অর্থাৎ, **আর মানুষ তা-ই লাভ করে যার জন্য সে চেষ্টাসাধনা করে।** আরো বলেছেন,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (সূরা আল-আনকাবুত: ৭০)

অর্থাৎ, **আর যারা আমাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য চেষ্টাপ্রচেষ্টা করে, (কঠোর সাধনা করে,) আমরা নিশ্চয় তাদেরকে আমাদের পথে পরিচালিত করব।**

তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা একথা বলে নিজের কল্যাণকে চেষ্টাপ্রচেষ্টা ও সাধনার ওপর নির্ভরশীল করেছেন। অর্থাৎ, তুমি চেষ্টা করলেই কল্যাণ বা অনুগ্রহ লাভ করবে, তাই সাধনা করো। তিনি (আ.) বলেন, এছাড়া এতে সাহাবীদের (রা.) কর্মপন্থা আমাদের জন্য এক আদর্শ ও উত্তম দৃষ্টান্ত। সাহাবীদের জীবনের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ করে দেখো, তাঁরা কি কেবল সাধারণ নামাযের মাধ্যমেই সেই সুউচ্চ মাকাম বা মর্যাদা লাভ করেছিলেন? না, বরং তাঁরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজেদের প্রাণের প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করেন নি এবং ভেড়া-ছাগলের মতো আল্লাহ্র পথে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন। তখন গিয়ে তাঁরা এই উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

সাহাবীরা মহানবী (সা.)-এর সাহচর্যে ঐশী প্রেম লাভ করার চেষ্টা করেছেন এবং এজন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়ে গেছেন আর কুরবানীও করেছেন। এরপর তাঁরা এমন এক পদমর্যাদা লাভ করেছিলেন, যার ফলে আল্লাহ্ তা'লা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তিনি (আ.) বলেন, আমরা অধিকাংশ মানুষকে এমন দেখেছি যারা চায়, এক ফুৎকারেই তাদেরকে সেই উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে দেওয়া হোক এবং আরশ পর্যন্ত তাদের প্রবেশাধিকারের পথ উন্মুক্ত হোক। তিনি (আ.) বলেন, আমাদের রসূলে আকরাম (সা.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কে আছে? তিনি ছিলেন 'আফযালুল বাশার' (শ্রেষ্ঠ মানব), 'আফযালুর রুসুল' (শ্রেষ্ঠ রসূল) ও 'আফযালুল আম্বিয়া' (শ্রেষ্ঠ নবী)। তিনিই যেক্ষেত্রে ফুৎকারের মাধ্যমে সেসব কাজ করতে পারেন নি, তাহলে আর কে আছে যে এমনটি করতে পারে? দেখো, তিনি হেরা গুহায় কেমন কঠোর সংগ্রাম ও সাধনা করেছেন। আল্লাহ্ই জানেন, কত দীর্ঘকাল পর্যন্ত তিনি কাকুতি-মিনতি ও আহাজারি করেছেন। আত্মশুদ্ধির জন্য তিনি কীরূপ প্রাণান্তকর চেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রম করেছেন! তার পর গিয়ে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আশিস অবতীর্ণ হয়েছিল। আসল কথা হলো, মানুষ আল্লাহ্র পথে যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের ওপর এক মৃত্যু এবং বিলীন হবার অবস্থা আনয়ন না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ প্রান্ত থেকে কোনো ভ্রূক্ষেপ করা হয় না। তবে আল্লাহ্ যখন দেখেন, মানুষ নিজের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত চেষ্টাসাধনা করেছে এবং আমাকে পাবার জন্য নিজের ওপর মৃত্যু ডেকে এনেছে, তখন তিনি মানুষের কাছে আত্মপ্রকাশ করেন, তাকে ধন্য করেন এবং নিজ ক্ষমতার নিদর্শন দ্বারা তাকে সম্মানিত করেন।

পুনরায় তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন, নবীদের প্রকৃতি এমনভাবে গঠিত যে, তাঁরা প্রসিদ্ধি বা খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা করেন না। কোনো নবী কখনোই খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা করেন নি। আমাদের মহানবী (সা.)-ও নির্জনতা ও একাকীত্ব পছন্দ করতেন। তিনি ইবাদত করার জন্য লোকালয় থেকে দূরে এক নির্জন গুহা তথা হেরা গুহায় চলে যেতেন। এই গুহাটি এমন ভয়ানক ছিল যে, কোনো মানুষ সেখানে যাবার সাহস করত না; কিন্তু তিনি এটিকে এজন্য বেছে নিয়েছিলেন যেন ভয়ে কেউ সেখানে না যায়। তিনি (সা.) সম্পূর্ণ একাকীত্ব চাইতেন। খ্যাতি তিনি কখনোই পছন্দ করতেন না। এরই মধ্যে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে নির্দেশ আসে,

يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ (সূরা আল-মুদ্দাসসিরঃ ২-৩)

অর্থাৎ, **হে কম্বল পরিহিত (ব্যক্তি)! দণ্ডায়মান হও এবং মানুষকে সতর্ক করো।**

এই নির্দেশে একটি বাধ্যবাধকতা পরিলক্ষিত হয় এবং এই কারণেই জোরালোভাবে সাথে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যে একাকীত্বকে তিনি (সা.) অত্যন্ত পছন্দ করেন– তা যেন এখন বর্জন করেন।

কাজেই, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসা যখন পরম মানে উপনীত হয় এবং তাঁর চেষ্টাসাধনাও চূড়ান্ত মানে উপনীত হয়, তখন আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে স্বীয় সর্বশেষ শরীয়ত প্রচারের জন্য পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি গভীর প্রেম ও ভালোবাসা তো ছিলই, কিন্তু এর সাথে এক কঠোর সাধনাও ছিল, যার ফলে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে অসংখ্য নিয়ামতে ভূষিত করেন। আর প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ মর্যাদা অনুযায়ী যতক্ষণ পর্যন্ত চেষ্টাসাধনা না করে, ততক্ষণ আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছানো কঠিন হয়ে থাকে।

আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসায় মহানবী (সা.)-এর নামাযের অবস্থা এমন ছিল যে, মুতাররিফ (রা.) তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে যাই, তখন তিনি নামায পড়ছিলেন। তাঁর বুকের ভেতর এমন শব্দ বের হচ্ছিল যেমনটি পাতিলে টগবগ করে পানি ফোটার শব্দ হয়। তিনি এমন প্রচণ্ডভাবে কাঁদছিলেন এবং আহাজারি করছিলেন, মনে হচ্ছিল যেন পাতিলে টগবগ করে পানি ফুটছে।

একইভাবে হযরত আয়েশা (রা.) একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন, যার উল্লেখ আমি গত একটি খুতবায় করেছি, তিনি (সা.) এত বেশি ইবাদত করতেন এবং ইবাদতের সময় এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তাঁর পা ফুলে যেত।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মহানবী (সা.)-এর ঐশীপ্রেম এবং ইবাদতের উল্লেখ করতে গিয়ে এক জায়গায় বলেন, [এর কিছু অংশ আমি আগেও বর্ণনা করেছি, গত খুতবার আগের খুতবায়, যেখানে আমি (তাঁর) জীবনচরিত বর্ণনা করেছিলাম, কিন্তু এর আরো কিছু বিশদ বিবরণ রয়েছে, তাও বর্ণনা করছি। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও অনুরাগের বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়ে যায়।] হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লেখেন,

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, যখন মহানবী (সা.) অন্তিম অসুস্থতা বা অন্তিম শয্যায় ছিলেন, তখন প্রচণ্ড দুর্বলতার কারণে নামায পড়াতে সক্ষম ছিলেন না। একারণে তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-কে নামায পড়ানোর নির্দেশ দেন। যখন হযরত আবু বকর (রা.) নামায পড়ানো শুরু করেন, তখন তিনি (সা.) কিছুটা আরাম বোধ করেন এবং নামাযের জন্য বের হন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.)-কে নামায পড়ানোর নির্দেশ দেবার পর যখন তিনি রোগের কষ্ট কিছুটা কম অনুভব করেন, তখন তিনি দুইজন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে নামাযের জন্য বের হন। তিনি (রা.) বলেন, সেই মুহূর্তের দৃশ্যটি এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে; প্রচণ্ড ব্যথার কারণে তাঁর পবিত্র পা মাটিতে ছেঁচড়ে যাচ্ছিল। তিনি (সা.) যখন মসজিদে পৌঁছেন এবং হযরত আবু বকর (রা.) পেছনে সরে আসার উপক্রম করেন, তখন মহানবী (সা.) তাঁর সংকল্প অনুধাবন করতে পারেন এবং তাকে নিজের স্থানে থাকার জন্য ইঙ্গিত করেন। অতঃপর তাঁকে (সা.) সেখানে নিয়ে আসা হয় এবং তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-র পাশে উপবিষ্ট হন। এরপর মহানবী (সা.) নামায পড়তে শুরু করেন এবং হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর নামাযের অনুকরণে নামায পড়তে থাকেন এবং বাকি মানুষজন হযরত আবু বকর (রা.)-র নামাযের অনুসরণ করতে থাকেন।

এই হাদীস থেকে জানা যায়, তাঁর যত গুরুতর অসুখই হোক না কেন, তিনি আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ করার বিষয়টি ভুলে যেতেন না। সাধারণত মানুষকে দেখা যায়, সামান্য একটু কষ্ট হলেই সব ইবাদত ভুলে যায়। বাজামা'ত নামায এবং অন্যান্য শর্ত পালনে তো প্রায়ই আলসেমি দেখা দেয়। কিন্তু তাঁর অবস্থা এমন ছিল যে, সামান্য রোগ তো দূরের কথা, যে রোগে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং যার তীব্রতা এমন ছিল যে, তিনি বারবার মূর্ছা যাচ্ছিলেন এবং উঠে দাঁড়াতে অক্ষম ছিলেন– সেই অবস্থাতেও যখন নামায শুরু হয়ে যায়, তখন তিনি চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকা সহ্য করতে পারেন নি। সঙ্গে সঙ্গে দুইজন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে, (চরম) দুর্বলতা সত্ত্বেও, টলোমলো পায়ে বাজামা'ত নামাযের জন্য মসজিদে গমন করেন। যদিও বাহ্যত এ বিষয়টি সামান্য মনে হতে পারে, কিন্তু মহানবী (সা.)-এর সেই অবস্থার প্রতি একটি লক্ষ করুন, যাতে তিনি আক্রান্ত ছিলেন। এরপর তাঁর যিকরে ইলাহীর (তথা আল্লাহ্কে স্মরণ করার) সেই গভীর আগ্রহের প্রতি লক্ষ করুন, যার বশবর্তী হয়ে তিনি নামাযের জন্য দুইজন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে (মসজিদে) উপস্থিত হন। তাহলে বুঝতে পারবেন, এই ঘটনাটি কোনো সাধারণ ঘটনা ছিল না; বরং তাঁর হৃদয়ে যিকরে ইলাহীর যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল, এটি তা বহিঃপ্রকাশের একটি দর্পণ। প্রত্যেক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি অনুধাবন করতে পারবেন যে, যিকরে ইলাহী ছিল তাঁর (সা.) খোরাক এবং এটি ছাড়া তিনি তাঁর জীবনে কোনোই স্বাদ পেতেন না। এরই প্রতি তিনি (সা.) ইঙ্গিত করেছেন, যেসব জিনিসকে আমি ভালোবাসি তার মধ্যে একটি হলো: قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ অর্থাৎ, নামাযে আমার চোখ স্নিগ্ধতা লাভ করে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে তাঁর বাজামা'ত নামায পড়া বা মসজিদে আসা কোনো আবশ্যকীয় বিষয় ছিল না। কারণ অসুস্থতার সময় ইসলামী শরীয়ত কাউকে এসব শর্ত পূরণ করতে বাধ্য করে না। অসুস্থ হলে বাড়িতে নামায পড়া যেতে পারে। কিন্তু এটি ছিল 'প্রেমের শরীয়ত'। একটি ছিল শরীয়তের নির্দেশ, কিন্তু মহানবী (সা.) যে শরীয়তের ওপর আমল করেছেন তা ছিল 'ভালোবাসার শরীয়ত', যা ছিল মহানবী (সা.)-এর ব্যবহারিক আমল। ওগুলো তো শরীয়তের বিধিবিধান, কিন্তু এটি ছিল ভালোবাসার শরীয়ত, অনুরাগের বিষয়। এগুলো ছিল ভালোবাসার বিধান যা এর (তথা শরীয়তের বিধানের) ঊর্ধ্বে ছিল। এর ভেতর থেকে ভালোবাসা ও অনুরাগ ঝরে পড়ছিল।

যদিও শরীয়ত তাঁকে অবকাশ দিয়েছিল, তিনি চাইলে বাড়িতেই নামায পড়তে পারতেন; কিন্তু যিকরে ইলাহীর প্রতি তাঁর যে (গভীর) ভালোবাসা ছিল, তা তাঁকে বাধ্য করত– যা-ই হোক না কেন, তিনি যেন সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করে, সকল শর্তাবলি সহকারে যিকরে ইলাহী করেন এবং নিজের প্রিয়তমকে স্মরণ করেন। এমন কষ্টের অবস্থায়ও যখন যিকরে ইলাহীর সাথে তাঁর এরূপ সম্পৃক্ততা ছিল, তাহলে সুস্থ থাকাকালে অবস্থা কেমন ছিল– তা অনুমান করা যেতে পারে। মানুষ চিন্তা করতে পারে, তিনি কত আবেগের সাথে তাঁর প্রিয়তমের যিকর বা স্মরণে নিমগ্ন থাকতেন। আল্লাহ্ তা'লার সাথে মহানবী (সা.)-এর এমন নিবিড় সম্পর্ক ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লার উল্লেখ হওয়ামাত্রই তাঁর মাঝে এক প্রকার ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়ে যেত। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাঁর এমন গভীর ভালোবাসা ছিল যে, সুস্থতা ও অসুস্থতা– উভয় অবস্থায় আল্লাহ্ তা'লার স্মরণই ছিল তাঁর খোরাক। আর এটিই তিনি তাঁর উম্মত এবং তাঁর অনুসারীদের মাঝে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, যেন তাদের মাঝেও এই অভ্যাস গড়ে ওঠে।

যেমনটি পূর্বের খুতবায় আমি তাঁর (সা.) জীবনচরিত বর্ণনা করেছিলাম এবং একটি সংক্ষিপ্ত হাদীস বর্ণনা করেছিলাম; তাতে এমন কিছু বিস্তারিত বিষয় রয়েছে যা পুনরায় বর্ণনাযোগ্য। তাই আমি তা বর্ণনা করছি।

মহানবী (সা.) একবার বনী আমর বিন অউফ গোত্রের মাঝে বিবাদ মীমাংসা করিয়ে দেবার জন্য গিয়েছিলেন। [তাদের মধ্যে কোনো ঝগড়াবিবাদের বিষয় ছিল, তিনি (সা.) তা মীমাংসা করতে গিয়েছিলেন।] এর মধ্যে নামাযের সময় হয়ে যায় এবং মসজিদে নববীতে মুয়াযযিন আযান দেন এবং এরপর হযরত আবু বকর (রা.)-র কাছে এসে বলেন, "আপনি কি লোকদের নামায পড়াবেন? আমি কি ইকামত দেবো?" তিনি (রা.) উত্তরে বলেন, "হ্যাঁ (ঠিক আছে)।" এরপর হযরত আবু বকর (রা.) নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হন। ইতোমধ্যে মহানবী (সা.)-ও চলে আসেন। লোকেরা তখন নামায পড়ছিল। তিনি (সা.) এসময়ে একটি পথ অতিক্রম করে সামনে চলে যান এবং প্রথম কাতারে গিয়ে দাঁড়ান। তাঁর (সা.) আগমনের বিষয়টি বুঝতে পেরে লোকেরা তালি দিতে আরম্ভ করে যেন হযরত আবু বকর (রা.) বুঝতে পারেন। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) নামাযে অন্য কোনো দিকে মনোযোগ দিতেন না; নামাযে ও ইবাদতে তাঁর এক অদ্ভুত মগ্নতা ছিল এবং অন্য কোনো দিকে তার খেয়াল থাকত না। যখন তালি দেওয়া দীর্ঘায়িত হয়, তখন হযরত আবু বকর (রা.) মনোযোগী হন এবং বুঝতে পারেন, মহানবী (সা.) এসেছেন। মহানবী (সা.) তাঁর দিকে ইঙ্গিত করেন যে, "নিজের জায়গায় অবস্থান করো (অর্থাৎ নামায পড়াতে থাকো)।" তখন হযরত আবু বকর (রা.) নিজের হাত তোলেন এবং এই সম্মান প্রদানের জন্য আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসাকীর্তন করেন। এরপর তিনি (রা.) পেছনে সরে এসে কাতারে দাঁড়ান এবং মহানবী (সা.) সন্মুখে এগিয়ে যান ও নামায পড়ান। সালাম ফেরানোর পর তিনি (সা.) বলেন, "হে আবু বকর! আমি যখন নির্দেশ দিয়েছিলাম, তখন তোমাকে নামায পড়াতে কোন বিষয়টি বাধা দিয়েছিল?" এর উত্তরে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, [যেমনটি আমি আগেও বলেছি], **"ইবনে আবি কুহাফার এমন কী যোগ্যতা আছে যে, মহানবী (সা.)-এর সামনে দাঁড়িয়ে নামায পড়াবে!"** অতঃপর মহানবী (সা.) লোকদের প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং বলেন, "আমি লক্ষ করেছি, তোমরা অনেক তালি দিয়েছ। নামাযের মধ্যে যদি কোনো ঘটনা ঘটে (বা সমস্যা দেখা দেয়) তাহলে 'সুবহানাল্লাহ্' বলা উচিত; কারণ যখন নামাযী 'সুবহানাল্লাহ্' বলবে, তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সেদিকে (ইমামের) মনোযোগ নিবদ্ধ হবে। আর তালি দেওয়া তো মহিলাদের কাজ।"

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেছেন, এই হাদীসটি থেকে যদিও আরো অনেক শিক্ষা পাওয়া যায়, কিন্তু এই স্থানে আমি কেবল একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই আর তা হলো– মহানবী (সা.)-এর সারাজীবনের প্রচেষ্টা এটাই ছিল যে, যেভাবে হোক– মানুষের মুখে যেন আল্লাহ্‌র নাম জারি করা যায়। তিনি নিজে যেভাবে যিকর বা আল্লাহ্‌র স্মরণে মশগুল থাকতেন– তার অবস্থা তো বর্ণিত হয়েছেই, কিন্তু এই হাদীস থেকে এটি জানা যায় যে, তিনি প্রত্যেকের মুখেও এই শব্দগুলোই দেখতে চাইতেন। এখন আমাদের দেখা উচিত এবং আত্মপর্যালোচনা করা উচিত, আমাদের হৃদয়েও কি সব সময় আল্লাহ্ তা'লার স্মরণ বা চিন্তা থাকে, যেমনটি মহানবী (সা.) তাঁর উম্মতের কাছে প্রত্যাশা করতেন? আমাদের হৃদয়ে কি সেই পরিমাণ ব্যথা বা আকুতি আছে, নাকি আমরা কেবল আমাদের পার্থিব উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যই নামায এবং আল্লাহ্ তা'লার যিকরের দিকে মনোযোগ দিই এবং সাধারণ অবস্থায় ভুলে যাই?

অতঃপর তিনি (রা.) লেখেন, এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যা থেকে জানা যায় যে, তিনি (সা.) চাইতেন যেন আল্লাহ্ তা'লার যিকর অধিক পরিমাণে করা হয়। অতএব হাঁচি দেবার সময়, খাবার শুরু করার সময়, আবার তা শেষ করার পর, ঘুমানোর সময়, জাগ্রত হবার পর, নামাযের পর, কোনো বড়ো কাজ করার সময়, ওযু করার সময়− মোটকথা, অধিকাংশ কাজেই তিনি (সা.) মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার যিকরের প্রতি মনোযোগী করেছেন। যা থেকে প্রমাণ হয়, তিনি কেবল নিজেই যিকরে ইলাহী তথা আল্লাহ্র স্মরণে মশগুল থাকতেন না, বরং অন্যদের কাছ থেকেও এটাই চাইতেন যে, তারাও যেন আল্লাহ্র স্মরণে মগ্ন থাকে, যা তাঁর পূর্ণ ভালোবাসার প্রমাণ বহন করে এবং এ কথারই দলিল।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেছেন, আমি অনেক মানুষকে দেখেছি যারা সামান্য ইবাদত করেই অহংকারী হয়ে যায়। কয়েক দিনের নামায বা ইবাদতের পর তারা নিজেদেরকে ঢাল-তলোয়ারহীন ফেরাউন কিংবা 'ফখরে আউলিয়া' (ওলীগণের গর্ব) ভাবতে শুরু করে এবং দুনিয়া ও এর মাঝে যা কিছু আছে− তা তাদের দৃষ্টিতে তাচ্ছিল্যের বস্তু হয়ে যায়। তাদের কাছে বড়ো বড়ো মানুষেরও কোনো গুরুত্বই থাকে না। মানুষ তো দূরে থাক, তারা আল্লাহ্ তা'লার ওপরও নিজেদের অনুগ্রহ প্রকাশ করে এবং মনে করে, ইবাদত করে তারা যেন আল্লাহ্ তা'লার ওপর দয়া করেছে এবং তিনি (নাঊযুবিল্লাহ্) তাদের কাছে এজন্য ঋণী যে, তারা তাঁর ইবাদত করেছে; নতুবা ইবাদত না করলে তিনি কী-ইবা করতে পারতেন! আর যারা এরূপ প্রকৃতির নয়, অর্থাৎ যারা এই সীমা পর্যন্ত পৌঁছায় না− তাদের মধ্যেও অনেককে এমন দেখা গিয়েছে যে, 'আল্লাহ্ আমাদের জন্য কী করছেন'− এই কথা বলার মতো পর্যায়ে যদি তারা না-ও চলে গিয়ে থাকে, তবুও তাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রে এটিই দেখা গেছে যে, ইবাদত করার পর তাদের মাঝে কিছুটা অহংকার অবশ্যই চলে আসে। আর খুব কম সংখ্যক মানুষই এমন আছে যারা ইবাদতের পরেও নিজেদের বিনয়ী অবস্থায় অটল থাকে। এটিই পুণ্যবানদের দল যারা স্বীয় ইবাদতের ওপর বিনম্রভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে; এটাই সেই নেক লোকদের দল যারা বিনয়ের সাথে জীবন যাপন করে এবং সর্বদা ইবাদত করার পরও তা গোপন রাখে। তারা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসাকেও গোপন রাখে এবং এটিকেও আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ মনে করে যে, তিনি আমাদের এই সামর্থ্য দিয়েছেন যেন আমরা ইবাদতকারী হতে পারি। প্রকৃতপক্ষে এরাই পুণ্যবান মানুষের দল।

মানুষ জিজ্ঞেস করে, পুণ্য কী? বর্তমানে শিশু-কিশোররাও প্রায়ই এই প্রশ্ন করে থাকে। (আর এ-ও জিজ্ঞেস করে যে,) কীভাবে বুঝব− আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্ট হয়েছেন? আল্লাহ্ তা'লা এভাবেই সন্তুষ্ট হন যে, পুণ্যকর্ম করো এবং তা কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্যই করো। মানুষ নিজের পর্যালোচনা নিজেই করতে পারে, বাইরের কোনো মানুষকে বিচারক বানানোর প্রয়োজন নেই। মানুষ নিজেই বুঝতে পারে, সে যেসব পুণ্য করছে তা যদি আল্লাহ্ তা'লার জন্য করে থাকে, তবে আল্লাহ্ তা'লা নিশ্চয়ই তা পছন্দ করেন।

তিনি (রা.) লিখেছেন, তাহলে আপনি নিজেই অনুমান করতে পারেন যে, পুণ্যবানদের নেতা এবং নবীকূল শিরোমণি হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর অবস্থা কেমন ছিল? তিনি তো সকল গুণের সমাহার এবং সকল পুণ্যের উৎস ছিলেন। অহংকার বা গর্ব প্রদর্শনের জন্য ইবাদত করা তো দূরের কথা, তিনি আল্লাহ্ তা'লার বন্দেগী বা ইবাদত যত বেশি করতেন, তাঁর ব্যাকুলতার অগ্নি তত বেশি তীব্রতর হতো। ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্

তা'লাকে নিজের প্রতি কৃতজ্ঞ করার পরিবর্তে তিনি নিজেই কৃতজ্ঞতাবশে লজ্জিত হতেন যে, **হে আল্লাহ্! ইবাদতের এই যে তৌফিক লাভ হচ্ছে– তা তো তোমারই কৃপায় অর্জিত হচ্ছে!** তাঁর ইবাদত এক অবিরাম ধারার ন্যায় ছিল। সময়ের কিছু অংশ যখন ইবাদতে কাটাতেন তখন তিনি চিন্তা করতেন, আল্লাহ্ তা'লার বড়োই অনুগ্রহ যে, তিনি এই কাজের তৌফিক দান করেছেন এবং এই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা আদায় করা আবশ্যক। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সেই আবেগেই আত্মহারা হয়ে তিনি আরো কিছুক্ষণ ইবাদত করতেন। পুনরায় সেটাকেও আল্লাহ্ তা'লার একটি অনুগ্রহ মনে করতেন যে, কৃতজ্ঞতা আদায় করাও প্রত্যেকের কাজ নয়, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ হয়। [অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যে তৌফিক লাভ হয়েছে, সেটিও আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের কারণেই হয়েছে।] ফলে আরো বেশি তাঁর হৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকাশ পেত এবং তিনি পুনরায় তাঁর প্রভুর ইবাদতে মশগুল হয়ে যেতেন। এই গোপন আলাপ ও মিনতির ধারা এতই দীর্ঘ হতো যে, বারংবার ইবাদত করতে করতে তাঁর পা ফুলে যেত। সাহাবীগণ নিবেদন করতেন, **হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার এত ইবাদতের কী প্রয়োজন? আপনার তো পূর্বাপর সকল ত্রুটি ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে!** এর উত্তরে তিনি কেবল এটাই বলতেন, **তবে কি আমি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?**

হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল করীম (সা.) নামাযের জন্য যখন দাঁড়াতেন তখন দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন। পূর্বেও এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর পায়ের পাতা বা গোছা ফুলে যেত। মানুষ যখন তাঁকে বলত, আপনি কেন এমনটি করেন? তখন তিনি উত্তর দিতেন, **আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?** আল্লাহু আকবার! কেমন প্রণয় আর কেমন ভালোবাসা আর কেমন প্রেম এটি! তিনি (সা.) আল্লাহ্ তা'লার স্মরণে দণ্ডায়মান হলে নিজের শরীর ও অস্তিত্বের প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপই তাঁর থাকত না। রক্ত সঞ্চালন নিম্নমুখী হবার ফলে তাঁর পা ফুলে যেত, কিন্তু (আল্লাহ্‌র) ভালোবাসা সেদিকে খেয়ালই যেতে দিত না। আশপাশের মানুষ দেখে অবাক হয়ে যেত যে, এ তিনি (সা.) কী করছেন! তাঁর সেই কষ্ট দেখে তারা অর্থাৎ আশপাশের লোকজন ব্যথা অনুভব করত। তারা এদিকে তাঁর (সা.) মনোযোগ আকর্ষণ করে বলতেন, আপনি কেন এমন করছেন? কেন নিজেকে এই কষ্টের মাঝে ফেলছেন এবং এত দুঃখ সইছেন? অন্তত কিছুটা তো নিজের স্বাস্থ্য এবং নিজের আরামের চিন্তা করা উচিত। কিন্তু সেই দুঃখ যা মানুষকে অস্থির করে দেয় এবং যা দেখে অন্যরা প্রভাবিত হয়, তা তাঁর ওপর কোনো প্রভাব ফেলত না। ইবাদতে কোনো প্রকার অলসতা করা কিংবা ভবিষ্যতে এত দীর্ঘ সময় ধরে নিজ প্রভুর স্মরণে দাঁড়িয়ে থাকার অভ্যাস বর্জন করার পরিবর্তে তিনি তাদের এই কথা অপছন্দ করতেন এবং তাদেরকে উত্তর দিতেন, **আমি কি আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?** তিনি আমার ওপর এত অনুগ্রহ করেন, এত কৃপা করেন, আমার প্রতি এত স্নেহময় ব্যবহার করেন, তবে কি তাঁর এই উত্তম ব্যবহারের বিনিময়ে আমি তাঁর নামের যিকর বা স্মরণ করব না? তাঁর বন্দেগী বা ইবাদতে আসল্য প্রদর্শন শুরু করে দেবো? কত–না নিষ্ঠাপূর্ণ এবং কত–না কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী এই উত্তর, আর কীভাবে এটি তাঁর হৃদয়ের পবিত্র আবেগসমূহকে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করছে! আল্লাহ্‌র স্মরণ এবং তাঁর যিকরের এই ব্যাকুলতা কি আর কারো হৃদয়ে আছে? অন্য কেউ কি এর কোনো দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারে? অন্য কোনো জাতির কোনো মহাপুরুষ কি তাঁর এই নিষ্ঠার মোকাবিলা করতে পারে?

কিন্তু দেখুন, একদিকে তিনি নিজে যেমন এটি করতেন, তেমনিভাবে নিজ উম্মতের কাছেও এই প্রত্যাশা রাখতেন যে, তারাও যেন এমনটিই করে।

অতঃপর তিনি অর্থাৎ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এরই ধারাবাহিকতায় বলেন, তিনি (সা.) কীভাবে নিজের কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতেন! এমনটি ছিল না যে, কেবল ইবাদত করলেন আর বাকি সব কাজ শেষ হয়ে গেল। আর এমনও ছিল না যে, তিনি (সা.) রাতের বেলা ইবাদতের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন এবং সারা দিন ঘুমিয়ে কাটাতেন। কারণ যদি এমনটি হতো, তাহলে সেই অনুরাগ ও ব্যাকুলতার কথা জানা যেত না যা এই অবস্থায় বিদ্যমান যে, সারা দিনও তিনি (সা.) আল্লাহ্ তা'লার নামের প্রচার এবং তাঁর আনুগত্য ও আজ্ঞানুবর্তিতা প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকতেন। তিনি (সা.) নিজে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে ইমাম হয়ে নামায পড়াতেন। দূরদূরান্ত থেকে যেসব প্রতিনিধিদল ও দূত আসত, তিনি নিজেই তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাদের দাবি-দাওয়ার উত্তর দিতেন। যুদ্ধের নেতৃত্বও তিনি নিজেই দিতেন। সাহাবীদেরকে কুরআন শরীফের শিক্ষাও দিতেন, আবার নিজেই বিচারকও ছিলেন। সারাদিন মানুষের মধ্যে যত ঝগড়া-বিবাদ হতো, তিনি সেগুলোর মীমাংসা করতেন। সম্পদের ব্যবস্থাপনা, বায়তুল মালের ব্যবস্থাপনা, দেশের ব্যবস্থাপনা, ইসলামের প্রচার ও প্রসার, স্ত্রীদের অধিকার পূরণ, অতঃপর ঘরের কাজকর্মে অংশ নেওয়া– এই সমস্ত কাজ তিনি (সা.) দিনের বেলায় করতেন। আর এই সব কাজ সম্পন্ন করার পর ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে সূর্য না ওঠা পর্যন্ত মাথা না তোলার পরিবর্তে তিনি বারবার উঠে বসতেন এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতেন। আর মাঝরাত অতিবাহিত হবার পর উঠে ওযু করতেন এবং যখন চারিদিকে নীরবতা ও নিস্তব্ধতা ছেয়ে থাকত, তখন সম্পূর্ণ একাকী নিজ প্রভুর দরবারে অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন। আর তিনি (সা.) এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তাঁর পদযুগল ফুলে যেত। এমনকি আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) বলেন, একবার আমিও তাঁর (সা.) সাথে নামায পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেলাম, তখন আমি এত কষ্ট অনুভব করলাম যে, আমি নামায ভেঙে পালিয়ে যাবার উপক্রম হচ্ছিল; কারণ আমার পা তখন আর বেশি ভার সহ্য করতে পারছিল না এবং এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা আমার শক্তির বাইরে ছিল। এটি ছিল সেই ব্যক্তির বক্তব্য যিনি যুবক ছিলেন এবং মহানবী (সা.)-এর চেয়ে বয়সে অনেক ছোটো ছিলেন। এ থেকে বোঝা যায়, তাঁর (সা.) সাহস ও ভালোবাসার আবেগ এত তীব্র ছিল যে, বার্ধক্য এবং সারাদিন কাজকর্মে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি ইবাদতে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, যুবকরা এমনকি শক্তিশালী যুবকরাও– যাদের কাজ তাঁর কাজের তুলনায় নগণ্য ছিল– তারাও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না এবং ক্লান্ত হয়ে পড়ত। এই ইবাদত কেন ছিল? কী কারণে ছিল? তিনি এই কষ্ট কেন করতেন? তিনি এই কষ্ট সহ্য করতেন কেবল একারণে যে, তিনি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা ছিলেন এবং তাঁর হৃদয় আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজি দেখে সব সময় তাঁর যিকরের প্রতি অনুরাগী থাকত। আল্লাহ্ তা'লার সাথে তাঁর এক প্রগাঢ় ভালোবাসা ছিল।

আবু সালমা বিন আব্দুর রহমানের একটি বর্ণনা রয়েছে। তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, **রমযানে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নামায কেমন হতো?** এখনও এক মাস পর রমযান আসছে। আমরা তো রমযানে ইবাদত করিই, তবে আগেও করা উচিত। যাহোক, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, **তিনি (সা.) রমযানে বা অন্য কোনো মাসে এগারো**

**রাকআতের বেশি পড়তেন না**। নামায কেমন হতো? তিনি বলেন, তিনি (সা.) যে নফল আদায় করতেন তা এগারো রাকআতের বেশি হতো না। তিনি (সা.) চার রাকআত পড়তেন, আর সেগুলোর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞেস কোরো না; কত–না সুন্দর ও দীর্ঘ হতো সেসব নামায। পুনরায় তিনি (সা.) চার রাকআত নামায পড়তেন এবং সেগুলোর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞেস কোরো না। অতঃপর তিনি (সা.) তিন রাকআত নামায পড়তেন। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কি বিতর পড়ার আগে ঘুমিয়ে পড়েন? অর্থাৎ চার রাকআত পড়ে তারপর সামান্য বিশ্রাম নেন, এরপর বিতর পড়েন? তিনি (সা.) বলেন, আমার চোখ ঘুমায় ঠিকই, কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না, তা তো আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসায় জাগ্রত থাকে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর সীরাত বর্ণনা করতে গিয়ে এক স্থানে তাঁর ঐশী নৈকট্য সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা অন্য এক স্থানে এই ঐশী নৈকট্য সম্পর্কে এভাবে বলেছেন যে,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (সূরা আল-আনাম: ১৬৩)

অর্থাৎ, "তুমি (তাদের) বলে দাও, 'আমার নামায এবং আমার কুরবানী আর আমার জীবন ও আমার মরণ আল্লাহ্ তা'লারই জন্য যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক'।"

অর্থাৎ লোকদের জানিয়ে দাও, আমার অবস্থা এমন যে, আমি আমার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছি। আমার সমস্ত ইবাদত আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত। এটি এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করছে যে, প্রত্যেক মানুষ– যতক্ষণ না সে কামেল তথা পরিপূর্ণ হয়– ততক্ষণ আল্লাহ্‌র জন্য একনিষ্ঠভাবে ইবাদত করতে পারে না। বরং তার কিছু ইবাদত আল্লাহ্‌র জন্য হয় আর কিছু হয়ে থাকে নিজের নফস বা ব্যক্তিসত্তার জন্য; কারণ সে নিজ ব্যক্তিসত্তার মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করে, যেমনটি আল্লাহ্‌র মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা উচিত, আর এটিই ইবাদতের মর্মবাণী। আর একইভাবে তার ইবাদতের একটি অংশ সৃষ্টির জন্য হয়ে থাকে। কারণ যে মহিমা, শ্রেষ্ঠত্ব, ক্ষমতা ও আধিপত্যকে আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট করা উচিত, সেই মহিমা ও ক্ষমতার অংশ সে সৃষ্টিকেও প্রদান করে। তাই সে যেমন আল্লাহ্‌র উপাসনা করে, তেমনই নফস ও সৃষ্টিরও উপাসনা করে; বরং সাধারণভাবে সমস্ত জাগতিক উপকরণকে নিজের উপাসনার অংশীদার করে নেয়। দুনিয়ার যে-সব তুচ্ছ উপকরণ রয়েছে সেগুলোকে অংশীদার করে, কারণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও তকদীরের বিপরীতে সে এই উপকরণগুলোকেও ইহজগত ও এর কর্মকাণ্ডে প্রভাব বিস্তারকারী মনে করে। সুতরাং এমন মানুষ আল্লাহ্ তা'লার সত্য উপাসক হতে পারে না, যে কখনও নিজের নফসকে আল্লাহ্‌র মহিমার অংশীদার করে, আবার কখনও সৃষ্টিকে এবং কখনও উপকরণসমূহকে। বরং সত্য উপাসক সে-ই, যে আল্লাহ্‌র সমস্ত মহিমা, সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব এবং সমস্ত আধিপত্য কেবল আল্লাহ্‌কেই অর্পণ করে, অন্য কাউকে নয়। আর যখন মানুষের উপাসনা তওহীদের এই স্তরে পৌঁছায়, তখনই সে প্রকৃতরূপে আল্লাহ্‌র উপাসক অভিহিত হতে পারে। আর এমন মানুষ মুখে যেমনটি বলে যে, আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়, অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ে, তেমনিভাবে সে নিজের কর্মের দ্বারা অর্থাৎ নিজের ইবাদতের দ্বারাও আল্লাহ্‌র তওহীদের সাক্ষ্য প্রদান করে। সুতরাং এই পূর্ণ স্তরের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যা উপরোক্ত আয়াতে মহানবী (সা.)-কে বলা হয়েছে যে, তুমি মানুষকে বলে দাও– আমার সমস্ত ইবাদত আল্লাহ্‌র জন্য; অর্থাৎ আমার ইবাদতে নফস, সৃষ্টি এবং জাগতিক

উপকরণের জন্য কোনো অংশ নেই। অতঃপর বলা হয়েছে, আমার কুরবানীও বিশেষত আল্লাহ্‌র জন্য, আমার জীবনও আল্লাহ্‌র জন্য এবং আমার মরণও আল্লাহ্‌র জন্য। মনে রাখা উচিত, আরবী ভাষায় 'নাসীকা' (نَسِيكَه) কুরবানীকে বলা হয় এবং আয়াতে বিদ্যমান 'নুসুক' (نُسُك) শব্দটি তার বহুবচন; আর এর দ্বিতীয় অর্থ ইবাদতও বটে। সুতরাং এখানে এমন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ ইবাদত এবং কুরবানী উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। এটি এই বিষয়ের প্রতি ইশারা করছে যে, পরিপূর্ণ ইবাদত– যার মাঝে নফস বা ব্যক্তিসত্তা, সৃষ্টি এবং উপকরণ শরীক নেই– তা প্রকৃতপক্ষে একটি কুরবানী এবং পরিপূর্ণ কুরবানী প্রকৃতপক্ষে পরিপূর্ণ ইবাদত। এরপর বলা হয়েছে যে, আমার জীবনও আল্লাহ্‌র জন্য এবং আমার মরণও আল্লাহ্‌র জন্য। এই শেষ বাক্যটি 'কুরবানী' শব্দের ব্যাখ্যা, যেন কেউ এই সংশয়ে না পড়ে যে, কুরবানী বলতে এখানে ছাগল, গরু বা উটের কুরবানী বোঝানো হয়েছে। বরং 'আমার জীবন এবং আমার মরণ কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য'– এই কথাটি দ্বারা যেন স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, এই কুরবানী দ্বারা আত্মার কুরবানী বোঝানো হয়েছে। আর কুরবানী শব্দটি 'কুরব' (তথা নৈকট্য) থেকে নেওয়া হয়েছে এবং এটি এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতবাহী যে, আল্লাহ্‌র নৈকট্য তখনই লাভ হয় যখন সমস্ত আত্মিক শক্তি এবং প্রবৃত্তির তাড়নার ওপর মৃত্যু এসে যায়।

বস্তুত এই আয়াতটি মহানবী (সা.)-এর পূর্ণ নৈকট্যের এক সুমহান দলিল। আল্লাহ্ তা'লার সাথে তাঁর এক পরম ও পূর্ণাঙ্গ নৈকট্য রয়েছে। আর এই আয়াতটি বলে দিচ্ছে, মহানবী (সা.) আল্লাহ্‌র সত্তায় এতটাই বিলীন ও নিমগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁর জীবনের প্রতিটি নিশ্বাস এবং তাঁর মৃত্যু কেবল আল্লাহ্‌র জন্যই হয়ে গিয়েছিল। আর তাঁর অস্তিত্বে নফস, সৃষ্টি এবং পার্থিব উপায়-উপকরণের কোনো অংশ অবশিষ্ট ছিল না; আর তাঁর রূহ আল্লাহ্‌র দরবারে এমন একনিষ্ঠভাবে লুটিয়ে পড়েছিল যে, তাতে অন্য কিছুর বিন্দুমাত্র সংমিশ্রণ ছিল না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অন্যত্র বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যদিও কিছু বিষয় বৈধ করেছেন, কিন্তু এর অর্থ এটি নয় যে, সারা জীবন তাতেই ব্যয় করে দিতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা তো তাঁর বান্দাদের গুণাবলি সম্পর্কে বলেন: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (সূরা আল-ফুরকান: ৬৫) অর্থাৎ, আর সেসব লোক যারা তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত অবস্থায় ও দাঁড়িয়ে রাত অতিবাহিত করে। অর্থাৎ তারা তাদের প্রতিপালকের জন্য সারা রাত সিজদায় ও দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দেয়। এখন দেখো, যে ব্যক্তি রাত-দিন স্ত্রীদের মাঝে ডুবে থাকে, সে আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় অনুযায়ী রাত কীভাবে ইবাদতে কাটাতে পারে? এরূপ ব্যক্তিরা যেন স্ত্রীদেরকে আল্লাহ্‌র বিপরীতে শরীকস্বরূপ দাঁড় করায়। মহানবী (সা.)-এর নয়জন স্ত্রী ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সারা রাত আল্লাহ্‌র ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন। এক রাতে তাঁর পালা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-র নিকট ছিল। রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হবার পর হযরত আয়েশার চোখ খুলে যায়। তিনি দেখলেন, মহানবী (সা.) নেই। তাঁর মনে সন্দেহ জাগল, হয়ত তিনি (সা.) অন্য কোনো স্ত্রীর ঘরে গিয়েছেন। তিনি উঠে প্রতিটি ঘরে সন্ধান করেন, কিন্তু তাঁকে (সা.) পান নি। পরিশেষে দেখলেন, তিনি (সা.) কবরস্থানে রয়েছেন এবং সিজদায় ক্রন্দন করছেন। এখন দেখো, তিনি (সা.) জীবিত ও প্রিয়তমা স্ত্রীকে ছেড়ে মৃতদের স্থান কবরস্থানে গেলেন এবং কাঁদতে থাকলেন। তাহলে কি এটা বলা সম্ভব যে, তাঁর (সা.) ক্ষেত্রে স্ত্রীগণ কামনা চরিতার্থের বা প্রবৃত্তির বাসনা

অনুসরণের জন্য ছিলেন, যেমনটি কি না আপত্তিকারীরা তাঁর (সা.) সম্পর্কে আপত্তি করে থাকে? মোটকথা, ভালোভাবে মনে রেখো, আল্লাহ্‌র আসল উদ্দেশ্য হলো তোমাদের ওপর যেন কুপ্রবৃত্তি প্রবল না হয়। আর তাকওয়ার পূর্ণতার জন্য যদি প্রকৃত প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করো। তিনি (আ.) জামা'তের সদস্যদের প্রতিও এই সাধারণ নসীহত করেছেন যে, তাকওয়ার নিরিখে যদি বিয়ে করতে হয় তবে করো, কিন্তু এটি যেন ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা ও কুপ্রবৃত্তির খাতিরে না হয় যে, বিয়ে করা হবে বা অধিক স্ত্রী গ্রহণ করা হবে। আজকাল এ বিষয়ে অনেক অভিযোগও আসে। ইসলাম এর অনুমতি দেয় না। প্রয়োজন বৈধ হওয়া উচিত। ইসলামে যারা অবৈধভাবে বিয়ে করে, মূলত তাদের কারণেই ইসলামের ওপর আপত্তি করা হয় যে, ইসলামে (একাধিক) বিয়ের অনুমতি রয়েছে। কিন্তু মুসলমানদেরও মনে রাখা উচিত এবং যারা আপত্তি করে তাদেরও জানা থাকা উচিত, এর জন্যও কিছু শর্ত রয়েছে এবং সেগুলো পূরণ করা অপরিহার্য।

একটি রেওয়ায়েতে হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, ইতিপূর্বেও এই হাদীসটি খুতবায় বর্ণনা করেছি; মহানবী (সা.) বলেছেন যে, জাগতিক জিনিসগুলোর মধ্য থেকে স্ত্রী ও সুগন্ধি আমার কাছে প্রিয়, কিন্তু সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটি আমার প্রিয় এবং আমার চোখ জুড়ানোর কারণ– তা হলো নামায।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র পক্ষ থেকে এর একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে, যা আমি পুনরায় এই কারণে এখানে উপস্থাপন করছি। তিনি (রা.) এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন:

قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ অর্থাৎ, নামাযে আমার চোখের স্নিগ্ধতা রাখা হয়েছে। এটিও একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্য যা অন্যান্য ধর্মের তুলনায় ইসলাম লাভ করেছে। পৃথিবীতে এমন কোনো জাতি নেই যাদের মাঝে নামাযের মতো ইবাদতে এমন নিয়মবদ্ধতা রাখা হয়েছে। পূর্ববর্তী সকল ধর্ম হয় বাহ্যিক অঙ্গসঞ্চালনার ওপর জোর দিয়েছে, অথবা তাদের মাঝে ইবাদতের সময়গুলোর ব্যবধান এত দীর্ঘ রাখা হয়েছে যে, আধ্যাত্মিকতা দুর্বল হয়ে যায়। কিন্তু একমাত্র ইসলামই এমন একটি ধর্ম যার অনুসারীদের দিনে পাঁচবার ইবাদতের জন্য আহ্বান করা হয়। অন্য কোনো ধর্ম এমনটি নয়। এখন মানুষজনের এটা ভাবা উচিত, যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছে, তখন সেগুলো আদায় করাও জরুরি যেন আধ্যাত্মিকতা বজায় থাকে; কেবল দুনিয়াদারিতেই মগ্ন থাকবে না। তিনি লিখেছেন, খ্রিষ্টান ও হিন্দুরা সপ্তাহে একবার ইবাদতের জন্য যায়; হতে পারে, তাদের কেউ কেউ রাত-দিন ইবাদত করে, কিন্তু এখানে জামা'তবদ্ধ বা সমষ্টিগত ইবাদতের কথা বলা হচ্ছে। একদিনে কয়েকবার ইবাদত করার নির্দেশ রসূলে করীম (সা.)-ই দিয়েছেন। এছাড়া সালাতের একটি অর্থ দোয়াও হয়ে থাকে। আর এভাবে মহানবী (সা.) দোয়ার প্রতি জোর দিয়েছেন। অন্যান্য ধর্মের ইবাদতগুলোতে বাহ্যিক বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলোর মাধ্যমে ইবাদতে স্বাদ সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন আর্যসমাজী ও খ্রিষ্টানদের মাঝে নাচগান বা বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয়। কিন্তু রসূলে করীম (সা.) বলেন, আমাকে এমন ইবাদত দান করা হয়েছে যার মধ্যেই স্বাদ রয়েছে এবং এমন স্বাদ রয়েছে যার মোকাবিলা কোনো ধর্ম করতে পারে না। সুতরাং গানবাজনা নয়, বরং নীরবে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত, তাঁর প্রশংসা (তাহমীদ) ও পবিত্রতা বর্ণনা (তাকদীস) করা আর আল্লাহ্ তা'লার গুণগান

করা এবং কান্নাকাটি বা আহাজারি করা– এই বিষয়গুলো নিজগুণেই এরূপ আর এমন ইবাদত যার মাঝে তৃপ্তি বিদ্যমান এবং এর ফলে আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসাও বৃদ্ধি পায়।

অতএব, আমাদের তাঁর (সা.) আদর্শ অনুসরণে নামায ও ইবাদতের এই মান অর্জনের চেষ্টা করা উচিত; তবেই আমরা প্রকৃত অর্থে মুসলমান হিসেবে গণ্য হতে পারব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব (রা.)-কে একটি পত্র লিখতে গিয়ে তাতে লিখেছেন,

আপনি আপনার ব্যবহারিক কর্মপন্থার জন্য যা জিজ্ঞাসা করেছেন তা হলো, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রকৃত অনুসরণের প্রতি আগ্রহ ও অনুরাগ সৃষ্টি করুন। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রকৃত অনুসরণের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করুন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) যে-সব আমলের প্রতি অত্যন্ত গভীর ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন তা হলো দুটি– একটি হলো নামায এবং অন্যটি জিহাদ। নামায প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) বলেন: قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ অর্থাৎ আমার চোখের স্নিগ্ধতা নামাযে রাখা হয়েছে। আর জিহাদ সম্বন্ধে তিনি বলেন, আমি আকাঙ্ক্ষা করি, আমি যেন আল্লাহ্‌র পথে নিহত হই এবং পুনরায় জীবিত হই, এরপর পুনরায় নিহত হই ও পুনরায় জীবিত হই এবং পুনরায় নিহত হই। এটি বর্ণনা করার পর তিনি (আ.) বলেন, সুতরাং এ যুগে জিহাদ আধ্যাত্মিক রূপ ধারণ করেছে এবং এই প্রকারের জিহাদ হলো ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা, বিরোধীদের অভিযোগের জবাব দেওয়া, সত্য-সুদৃঢ় ধর্ম ইসলামের সৌন্দর্য পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া এবং মহানবী (সা.)-এর সত্যতা বিশ্বের কাছে প্রকাশ করা। এটাই জিহাদ, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীতে অন্য কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন।

অতএব, আমাদের কলম এবং তবলীগের জিহাদেও তখনই বরকত হবে যখন আমরা আমাদের ইবাদতের মান এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসাকে বৃদ্ধি করব। আমরা যদি এই জিহাদে অংশ নিতে চাই, তবে আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা ও দোয়ার প্রতি আমাদের মনোযোগ দিতে হবে এবং আমাদের ইবাদতসমূহের প্রতিও আমাদের মনোযোগী হতে হবে। আর আমরা যদি তাঁর (সা.) আদর্শ অনুসরণ করে এমনটি করি, তবেই আমাদের কাজে বরকত সৃষ্টি হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

আজ বাংলাদেশ জামা'তের জলসাও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেখানে যথেষ্ট বিরোধিতাও হয়ে থাকে। তাদের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদের সবাইকে স্বীয় সুরক্ষার বেষ্টনীতে রাখেন এবং তাদের জলসাও যেন সফলভাবে ও নিরাপদে সমাপ্ত হয়। (আমীন)

**(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)**